★ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার নগ্ন-রূপ ★

● শিল্পের গোড়া কেটে আগায় জলদান
● বক্তৃতার ফুলঝুরিতে দেশের উন্নতি আসবে না

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] শুক্রবার ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৩, ২রা মাঘ, ১৩৫৯ [এক আনা

গত ১৯শে ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেণ্টে বহু-বিঘোষিত "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা" গৃহীত হয়েছে। সরকারী মহল থেকে এই পরিকল্পনার প্রশংসায় বহু ঢাক ঢোল পেটানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। একে একাধারে যুগান্তকারী সমাজতান্ত্রিক, কল্যাণকর ও সর্ব্বাঙ্গীন পরিকল্পনা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা, রেডিও, বক্তৃতামঞ্চ ইত্যাদির প্রচারের তাণ্ডবে সাধারণ লোককে হতবাক করে দেবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের মনে এই "ঢাক ঢোল পেটানো পরিকল্পনা" বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি—কোন আশার আলোই দেখাতে পারেনি। কিন্তু তবুও একে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন—প্রয়োজন সমস্ত প্রকার অপপ্রচারকে ব্যর্থ করার ও যদি কারো বিন্দুমাত্র ভ্রান্ত ধারনা থাকে তাকে দূর করার উদ্দেশ্যে।

প্রথমতঃ, তথাকথিত পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাতে পরিকল্পনার কথা শুনলেই তাঁরা আঁতকে ওঠেন, যেহেতু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কংগ্রেসী আমলে বড় একটা হয়নি। সেকথা বাদ দিয়ে দেখা দরকার যে, পুরোপুরিভাবে কার্য্যে পরিণত করলেও এই পরিকল্পনা দেশের মৌলিক সমস্যা সমাধানে সমর্থ কিনা—জনসাধারণের সত্যিকার দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করনে এটা বিন্দুমাত্র সহায়তা করবে কিনা। ২৭৫ জন কর্মচারীর প্রচেষ্টায় এবং ২৪ লক্ষ ৫ হাজার ১৬৩ টাকা ব্যয়ে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তাকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন পদ্ধতির বিশ্লেষণ ও পাঁচ বছর পরের অভীষ্ট লক্ষ্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে ; দ্বিতীয় অংশে স্থান লাভ করেছে জন-সহযোগিতার আলোচনা; এবং তৃতীয় অংশে বিভিন্ন উন্নয়নের কর্মসূচীকে পুনরায় তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—যথা—কৃষি, সেচ ও সমাজ উন্নয়ন ; শিল্প ও যোগাযোগ এবং সমাজ কল্যাণ ও কর্ম সংস্থান।

খসড়া পরিকল্পনা থেকে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে চূড়ান্ত রিপোর্টে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২০৬৮·৭৮ কোটী টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকা নিম্নলিখিতভাবে খরচ করা হবে।

	(মোট বরাদ্দের শতকরা হিসাব)	(কোটী টাকা হিসাবে)
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	১৭·৪	৩৬০·৪৩
সেচ ও বিদ্যুত	২৭·২	৫৬১·৪১
পরিবহন ও যোগাযোগ	২৪·০	৪৯৭·১০
শিল্প	৮·৪	১৭৩·০৪
সমাজ কল্যান	১৬·৪	৩৩৯·৮১
পুনর্বাসন	৪·১	৮৫·০০
বিবিধ	২·৫	৫১·৯৯
মোট—	১০০·০	২০৬৮·৭৮

কৃষি বনাম মূল-শিল্প

ওপরের হিসাব এবং পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যে যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেটা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার পেছনকার বিশ্লেষণ হচ্ছে যে, ভারতবর্ষ এক অনুন্নত দেশ এবং এই দেশের মৌলিক উন্নতি গ্রামোন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। কৃষির উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীন গ্রাম সংস্কারই নাকি এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই মোট বরাদ্দের মাত্র ৮·৪% শিল্প খাতে ধার্য্য করা হয়েছে। একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে ভারতবর্ষ এখনও অনুন্নত, এদেশের শতকরা ৭৫% ভাগেরও বেশী লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু একথা একমুহূর্ত্তের জন্যও ভুললেও চলবেনা যে আজ কৃষির উন্নতি শিল্পের উন্নতির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। যে দেশের শিল্পের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না সে দেশে চাষ-বাসের উন্নতির সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাসের প্রবর্ত্তন খুব স্বাভাবিক কারণেই শিল্পোন্নতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় অনুন্নত হলেও ভারতবর্ষ শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্যান্য বাস্তব অবস্থার দিক থেকে প্রচুর রয়ে গেছে। সরকারী প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য পেলে ভারতীয় শিল্প অনেক দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে পারে। বর্ত্তমান যুগে শুধু-মাত্র চাষবাসের উন্নতির ওপর নির্ভর করে কোন দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় আয় প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করা অসম্ভব। কৃষির প্রতি নজর রাখতে হবে নিঃসন্দেহে, কিন্তু শিল্পের উন্নতিই আজ দেশকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করতে পারে। অর্থাৎ কৃষির উন্নতির জন্যও শিল্পের উন্নতি অপরিহার্য। সুতরাং এই পরিকল্পনায় এক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ দিককে অবহেলা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, কমিউনিটি প্রোজেক্ট আজ গ্রাম উন্নয়নে ব্যর্থ হতে বাধ্য। যখন ধনতান্ত্রিক শোষণ দেশের অর্থনীতির বনিয়াদ, যখন বিভিন্ন প্রকার শোষণ ও শাসনের চাপে দেশের বেশীরভাগ লোক দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন গ্রাম সংস্কারের ক্ষীণ প্রচেষ্টা সরকারী কর্তৃপক্ষের মানসিক সন্তুষ্টি বিধান ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন ছাড়া শুধুমাত্র সদিচ্ছায় কোন কাজ হবে না। মূল ব্যাধি দূর করতে হবে নতুবা এহেন সংস্কার প্রলেপের কাজও করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

পরিকল্পনায় শিল্প প্রসঙ্গ যতটা নগণ্য স্থান লাভ করেছে সেখানেও প্রধান সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। বর্ত্তমান যুগে যে কোন দেশের শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে Machine Building Industry গড়ে তোলার ওপর। উৎপাদন-যন্ত্রের উৎপাদনের (Production of the means of Production) ব্যবস্থা না হলে শিল্পক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়া ও শিল্পের ব্যাপক উন্নতি অসম্ভব। যেমন কৃষির উন্নতির জন্য শিল্পের উন্নতির প্রয়োজন, তেমনি সামগ্রিকভাবে শিল্পের উন্নতিও আজ এই ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরীর ওপর নির্ভর করছে। আজও বিভিন্ন কলকারখানা ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে—এই দুর্ব্বলতাকে কাটাবার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টাও দেখা যাচ্ছে না। গত কয় বছরের ইতিহাসে দেখা গেছে যে সহজে বেশী মুনাফার প্রলোভনে বেশীরভাগ শিল্পপতি শিল্পো-নয়নের পথ ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের (Commercial) পথ বেছে নিচ্ছে। এতে দেশের শিল্পোন্নতি না হলেও শ্রমিক বিরোধ ইত্যাদির ঝুঁকি না নিয়েও মালিকের মুনাফার অঙ্ককে যথাসম্ভব স্ফীত করা যায়। এই নীতি বর্তমান পরিকল্পনাতেও প্রভাব বিস্তার করেছে ; ফলে দেশের শিল্পোন্নয়নকে ভীষণভাবেই ব্যাহত করা হয়েছে।

২৭ বছর পরে·····!

পরিকল্পনায় পরিষ্কারভাবে হিসাব করে দেখান হয়েছে যে প্রতি বছর অতিরিক্ত জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ করে মূলধন বৃদ্ধি পাবে এবং পাঁচ বছরে জাতীয় আয় শতকরা ১১ গুণ বর্দ্ধিত হবে। সাথে সাথে এ আশাও দেখান হয়েছে যে যদি পরিকল্পনা পূর্ণ সাফল্যের পথ বেয়ে চলে তাহলে ২৭ বছর পরে জাতীয় আয় দ্বিগুন হবে—অর্থাৎ ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানে পেট শুকিয়ে বসে থাকলে সাত শ বছর পরে ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ হবে। এ ধরণের উজ্জ্বল (!) ভবিষ্যতের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই সুদীর্ঘ সময়ে অনেক স্বাভাবিক জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সমস্যা এর গতিকে আরো শ্লথ করে দিতে পারে।

এই পরিকল্পনার মোট অর্থ বিভিন্ন সূত্রে আদায় করা হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদ্বৃত্ত বাজেট থেকে নেওয়া হবে ৭৩৮ কোটী টাকা, জন-সাধারণের নিকট থেকে ঋণ, মুদ্রা সঞ্চয় ইত্যাদি বাবদ ৫২০ কোটী টাকা। বাকী ৮১১ কোটী টাকা আসবে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশ থেকে পাওয়া গেছে ১৫৬ কোটী টাকা। এছাড়া আরো ৬৫৫ কোটী টাকা দরকার। বৈদেশিক সূত্রে না মিললে হয়তো জনতার ঘাড়ে পুনরায় বোঝা চালাবার চেষ্টা হবে। এ ভাবে বৈদেশিক সাহায্য নেবার অর্থ পরোক্ষভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ আধিপত্য ডেকে আনা, কেননা এপর্য্যন্ত দেখা গেছে যে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কখনো সম্মানজনক সর্ত্তে ঋণ বা সাহায্য দেয় নি।

পেছনে মার্কিনী মোড়ল

এ প্রসঙ্গে জনসাধারণের কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা দরকার। বর্তমান পরিকল্পনায় মার্কিণ স্বার্থের আধিপত্য কতটা প্রভাব বিস্তার করবে তা কয়েকটি

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লেনিন-দিবসের ডাক

এস. ইউ. সি-র কেন্দ্রীয় কমিটি আগামী ২১শে জানুয়ারী "লেনিন দিবস" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পার্টির সমস্ত ইউনিট ও কর্মীদের বৈঠক, সভা ও শোভাযাত্রার মারফৎ কংগ্রেসী ধনিক রাষ্ট্রের নববিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে রুটী, রুজি, শিক্ষা বাসস্থান ও শান্তির সংগ্রাম, কুখ্যাত সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট প্রজা-সোস্যালিষ্ট চক্রান্তের স্বরূপ উদঘাটনের সংগ্রাম ও সাচ্চা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল গড়ার সংগ্রামকে শক্তি-শালী করার শপথ লইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

লেভীপ্রথা খাদ্যসমস্যার এক চুল সুরাহা করিবে না

★ দুর্ভিক্ষ ও ঘাটতি ভূমি-ব্যবস্থারই নিত্য সহচর ★

কংগ্রেসী সরকার ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে তথাকথিত এক নূতন খাদ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই নীতি অনুযায়ী কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল ছাড়া জেলাগুলিতে কর্ডন তুলিয়া দিয়া খাদ্যশস্যের অবাধ চালানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য গ্রামাঞ্চল হইতে "লেভী প্রথায়" খাদ্য সংগ্রহ করা হইবে। যাহারা কমপক্ষে ৩০ বিঘা জমির মালিক, সেটা মালিক নিজেরাই চাষ করুন বা ভাগে চাষ করুন, মালিক একান্নবর্তী বা পৃথকান্ন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যাহাই হউক না কেন, সরকারী কর্মচারীর আদেশ এবং হিসাব অনুযায়ী উদ্বৃত্ত শস্য সরকারকে দিতে বাধ্য হইবে।

এই ব্যবস্থার মৌলিক গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্বে সরকারের ধাপ্পা পরিষ্কার ভাবে বুঝা দরকার। সাধারণভাবে লেভী ব্যবস্থায় অর্থ হইতেছে সরকার কর্তৃক ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে বিঘা প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য সংগ্রহ করা। ইহার দ্বারা কখনো সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত শস্যের সংগ্রহ বোঝায় না। সেই অর্থে নূতন খাদ্যনীতির মিথ্যা নামকরণ করা হইয়াছে।

সরকারী মহল হইতে এ বৎসর পশ্চিম বঙ্গের ফলন সম্পর্কে প্রচুর আশাপূর্ণ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ লেভী ব্যবস্থাকে এক যুগান্তকারী ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে সরকারী হিসাবের সত্যাসত্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। তদুপরি পশ্চিমবাংলায় পোকার উপদ্রবে যে পরিমাণ শস্য নষ্ট হইয়াছে তাহাতে ওয়াকিবহাল মহলের মতে প্রকৃত উৎপাদন সরকারী হিসাবের প্রায় অর্দ্ধেকে আসিয়া দাঁড়ায়। দেশে কোন্ খাদ্যনীতি প্রযোজ্য বা মৌলিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম সেটা বুঝিতে হইলে দেশের খাদ্যসমস্যাকে ভালভাবে অনুধাবন করা দরকার।

ব্যাধির মূল কোথায়

কংগ্রেসী সরকারের বহুমুখী ব্যর্থতার ভিতর দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানে ও ভূমিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে ব্যর্থতা অন্যতম। সরকারী খাদ্যনীতির কুফল বারবার দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ডাকিয়া আনিয়াছে; এই কিছুদিন পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা এক দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। ঠিক এই রকম সময়ে লেভী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন খাদ্য সমস্যায় মৌলিক সমাধানে কতটা সাহায্য করিতে পারে বা আদৌ পারে কিনা সেটা চিন্তা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ মনে রাখা দরকার, যতদিন পর্য্যন্ত না জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়, উৎপাদনের উপর চাষীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, "লাঙ্গল যার জমি তার" এই দাবী স্বীকৃত হয় এবং সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করা, বাঁধ ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্ত্তন ও জল সেচনের সুব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্ত্তন হয়, ততদিন খাদ্যসংকট হইতে স্থায়ী মুক্তি অসম্ভব। এই সমস্ত মৌলিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক না কেন তাহা কিছুটা প্রলেপের কাজ করিতে পারে কিন্তু মূল সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সুতরাং এই ধরণের প্রলেপের মোহে ভুল বুঝিলে চলিবে না সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

চাষী জুলুমের নতুন পরোয়ানা

দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, সরকারী মহল হইতে লেভী আদেশ সম্পর্কে যাহা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাই প্রয়োগ করা হইবে, না কি এই আদেশের যথেচ্ছ ব্যবহার হইবে। জনসাধারণের অভিজ্ঞতা হইতেই এই সংশয় দেখা দিয়াছে। প্রাক্তণ খাদ্য সংগ্রহ নীতিতেও একটা কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, ১৫ বিঘা বা তাহা অপেক্ষা কম জমির মালিক হইতে খাদ্য সংগ্রহ করা হইবে না। কিন্তু ঘটনা ঘটিয়াছে সম্পূর্ণ অন্যরূপ দরিদ্রচাষীর নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় ও বড় বড় জমিদার জোতদারদের রেহাই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও সেই প্রশ্ন উঠিবে—এতদিনের সরকারী দুর্নীতি এই প্রশ্ন এড়াইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে। সংবাদে প্রকাশ যে কোন ক্ষেত্রে ৩০ বিঘার কম জমির মালিকের ধানেরও সরকারী ভাবে হিসাব করা (assess) হইয়াছে, এবং বিভিন্ন জিলা হইতে ১৫দিন যাইতে না যাইতেই সরকারের ঘোষনাকে কাগজী প্রমান করিয়া ত্রিশ বিঘার চাইতে কম জমির মালিকের কাছ হইতেও ধান্য সংগ্রহ ও বলপ্রয়োগের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে এই ব্যবস্থায় গরীব চাষীদের ত কথাই নাই, এমনকি মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত চাষীদেরও বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিবে না ইহাতে বড় বড় জমিদারদের স্বার্থই ক্ষুন্ন হইবে।

এই ব্যবস্থাকে আর একদিক হইতেও একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ৩০ বিঘা জমির মালিক যাঁহারা নিজে চাষ করেন বর্গা প্রথায় চাষ করেন, তাঁহাদের কখনও বড় জমিদারের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলেনা। বিশেষতঃ, যাঁহারা বর্গা প্রথায় চাষ করেন তাহাদের পক্ষে একথা বেশী ভাবে প্রযোজ্য; যে হেতু উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধেক (স্থান বিশেষে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে) যে চাষী চাষ করে তাহার ঘরে চলিয়া যায়। সুতরাং এই সময় মধ্যবিত্তদের উপর সরকারী জুলম নিঃসন্দহে প্রযুক্ত হইবে। সরকারকে বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যা দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বড় বড় জমিদার জোতদারদের কাছ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং নিচের দিকে নিজে চাষ করিলে ৫০ বিঘা এবং ভাগে চাষ করিলে ১০০ বিঘা জমির মালিক হইতে শেষ সংগ্রহ করিলেও চলিতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাধারণ চাষীকে অনেকাংশে রেহাই দেওয়া যায়।

"যার ধন তার ধন নয়"

সরকার কর্তৃক উদ্বৃত্তের হিসাব আরও হাস্যকর। খোরাকীর জন্য বছরে মাথাপিছু ১০ মন, বীজের জন্য বিঘা প্রতি দশসের ও মজুরের খোরাকীর জন্য (প্রয়োজন হইলে) বিঘাপ্রতি ১ মন ধান ধরা হইবে—বাকী সমস্ত উদ্বৃত্ত হিসাবে গণ্য করা হইবে। কৃষকজীবনের সহিত যাহাদের বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে সাধারণ ভাবে জীবন ধারণ করিতে হইলেও আমাদের দেশের চাষীদের সকালের 'পান্তা' ও দুই বেলার খাওয়া ধরিয়া বৎসরে গড়ে ৯ মন চাউল অর্থাৎ ১৩৷৷০ মন ধানের প্রয়োজন। অথচ সরকারী হিসাবে ১০ মন ধান ধরা হইয়াছে। এ ছাড়া বাকী সমস্ত ধান দিতে হইলে আর একটি সমস্যা দেখা দিবে। যে বাংলা দেশের আথিতেয়তা বাঙ্গালী কৃষকের প্রাণের কথা এবং প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তাহার উপর খড়্গ চালানো হইবে। সুতরাং ইহার জন্যও কিছু ন্যায় সঙ্গত পরিমান খাদ্যশস্য প্রত্যেক কৃষকের ঘরেই থাকা প্রয়োজন।

জনমজুরের খোরাকীর জন্য ১ মন ধানে কিছুতেই চলিতে পারেনা বিঘাপ্রতি ধান ফলনের জন্য চাষের সময়ে মজুরের অন্তত পক্ষে ২½ মন ধান, তাহার মাহিনার কথা বাদদিয়াও, খোরাকীর জন্য লাগে।

ইহা ছাড়া সরকারী কর্তৃপক্ষ বিঘাপ্রতি ফলন ৬ মন ধান হিসাবে উদ্বৃত্ত ধার্য্য করিবেন। যেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিঘাপ্রতি ফলন ৪ মনের বেশী নহে সেখানে ৬ মন হিসাবে ধরিলে চাষীদের একান্ত প্রয়োজনীয় ধানও আদায় করা হইবে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে এ বৎসরে (১৯৫২ সালে) সুন্দরবন অঞ্চলে বিঘাপ্রতি ফলন গড়ে ২½ মন হইতে ৩ মন হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, ক্যানিং এবং জয়নগর থানায় বিঘাপ্রতি ৫ মন হিসাবে ধরা হইতেছে, যেখানে প্রকৃত ফলন তাহার অর্ধেক। ধানের জন্য সরকার মনপ্রতি ৮৷৷ টাকা (কোথাও আরো কম) দিবেন—সে টাকা একমন ধানের উৎপাদনের গড় খরচা হইতে অনেক কম। সুতরাং ইহার মাধ্যমেও কিছুটা জুলুম থাকিয়াই যাইবে।

উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে সরকার এ সম্পর্কে হিসাব করিয়া যে আদেশ দিবেন তাহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন আপীল করা চলিবে না। সরকারী কর্মচারী এমনকি পেট্রল পার্টির সদস্য যে কোন সময়ে বিনা নোটীশে গৃহে প্রবেশ করিতে বা তল্লাসী করিতে পারিবেন—এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

লেভী ব্যবস্থার প্রয়োগে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষের শুধু অজ্ঞতাই প্রকাশ করে না, উপরন্তু ইহার ভিতর দায়িত্ব এড়াইবার এক বিরাট চক্রান্ত রহিয়াছে। যেখানে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের খাদ্য-সরবরাহের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রহণ করিবার কথা ছিল, সেখানে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে প্রতিবৎসরে পশ্চিমবাংলা হইতে দেড় লাখ টন চাউল কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে দিতে হইবে। অর্ধমৃত পশ্চিমবাংলার উপর এই আক্রমনের কি যুক্তি আছে সেটা সাধারণলোকের বুঝা দুঃসাধ্য।

আন্দোলনের পথ একমাত্র পথ

এই আলোচনায় খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে লেভী প্রথা আমাদের দেশের এতদিনের খাদ্য সংকট দূরীকরণে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। গালভরা প্রচার সত্ত্বেও দেশের খাদ্যাভাব থাকিয়াই যাইবে। খাদ্যাবস্থায় স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সুতরাং সরকার এ বিষয়ে উদাসীন হইয়া বা কর্ত্তব্যহীনতার পরিচয় দিলেও জনসাধারণকে ভুলানো যাইবে না। লেভী আদেশ সরাসরিভাবে যে সমস্ত সাধারণ চাষীর উপর আঘাত হানিবে তাহাদেরও জানা দরকার যে স্বধুমাত্র তাহাদের পৃথক করিয়া ভাবিলে চলিবে না, সরকারের বিরুদ্ধে

সুসংবদ্ধভাবে গরীব চাষী, ক্ষেত মজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত চাষীরও সম্মিলিত আন্দোলন পরিচালনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়া গিয়াছে। এবং আন্দোলন শুধু লেভী প্রথার বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র সরকারী খাদ্যনীতি ও ভূমিব্যবস্থার গলদের বিরুদ্ধে চালাইতে হইবে। প্রতিটি অঞ্চলে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দাবীর ভিত্তিতে জঙ্গী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে :—

১। বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই।

২। কৃষকের হাতে জমি বণ্টন।

৩। খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে প্রতিনিধিত্বমূলক 'গণ-কমিটি' গঠন এবং সরকার কর্তৃক তাহাদের স্বীকৃতি।

৪। সাধারণভাবে ৫০ বিঘা ও বর্গা-প্রথায় চাষ করিলে ১০০ বিঘা জমির মালিকের কাছ হইতে খাদ্য সংগ্রহ।

৫। বৎসরে মাথাপিছু ১৩½ মন, মজুরের খোরাকীর জন্য ২½ মন, বীজধান ইত্যাদি ছাড়াও কিছু ধান রাখিয়া তবে উদ্বৃত্ত করতে হইবে।

৬। ধানের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে এবং সরকারকে 'স্লাইডিং প্রাইস'এ ধান কিনিতে হইবে।

৭। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের ঘাটতি পূরণের ভার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হইবে।

৮। বর্ত্তমান অবস্থায় কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে ধান দেওয়া চলিবে না।

৯। রেশনের দাম কমাইতে হইবে ও পরিমান বাড়াইতে হইবে।

১০। অতিরিক্ত চাউলের দোকান হইতে বর্দ্ধিত মূল্যে চাউল বিক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। সমস্ত চাউল রেশনের মূল্যে রেশন দোকান হইতে দিতে হইবে।

১১। প্রয়োজন মত সোভিয়েট ও চীন হইতে সম্মানজনক সর্তে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য-শস্য আনিতে হইবে।

১২। বাঁধ ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্ত্তন।

১৩। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও ক্রমশঃ যৌথব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

১৪। জলসেচনের ব্যবস্থা।

১৫। চাষ সম্পর্কে চাষীদের সচেতন করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

এই সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মারফৎ সরকারী খাদ্য-নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করুন, দেশকে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন।

ষ্টেট ট্র্যান্সপোর্ট পরিচালনার প্রকাশ্য তদন্ত হোক।

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

(৬) অকেজো গাড়ী গুলোকে চালাতে বাধ্য করা হয় ড্রাইভারদের এবং সেজন্য দুর্ঘটনা ঘটে প্রায়ই। কিন্তু তার ফলে ড্রাইভারদের করা হয় সাসপেণ্ড এবং ক্ষতি পূরণের জন্য তাদের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হয়। অথচ, পুলিশ কেসের কোন খরচ বা দায়ত্ব কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে না।

এই রকমের অজস্র গলদ এই বিভাগটিকে তার পত্তনের গোড়া থেকেই অযোগ্যতা ও দুর্নীতির ঘাঁটীতে পরিণত করে রেখেছে। শোনা যায়, এই বিভাগ থেকে সরকারের লোকসানই হ'চ্ছে। বিভাগটি এদিকে পাবলিক ইউটিলিটি কন্‌সার্ন বলে ঘোষিত হ'য়েছে। এর কর্মচারীরা পুরোপুরি এবং যথাসাধ্য খাটুনী খাটে। হিসাব থেকে দেখা যায় বছর বছর টিকেট বিক্রী লব্ধ টাকার পরিমাণ বেড়ে চলেছে, যেমন ১৯৫০-৫১ সালের আয় থেকে বেড়ে ১৯৫২-৫৩ তে হ'য়েছে ২½ গুণ। অর্থাৎ, যাত্রী বহন করা হ'চ্ছে আগের দ্বিগুণ বা আড়াই গুণ। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী বেড়েছে গত এক বছরে মোটে ১৫-২০%। কাজেই কর্মচারীদের ওপর খাটুনীর বোঝা বেড়েই চলেছে। প্রাইভেট-মালিকানার বাসগুলোতে যথেষ্ট লাভ হয় অথচ ষ্টেট বাসগুলো থেকে না হবার কোন কারণ আছে কি? এ থেকে শুধু বিভাগের অকর্মণ্যতাটুকুই প্রমাণিত হয়।

ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বিভাগের এই সমস্ত অব্যবস্থা-কুব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য জনসাধারণের তরফ থেকে জোরালো দাবী তোলা দরকার, অবিলম্বে প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ তদন্ত চালু করা হোক এবং একে এর বর্তমান অযোগ্যতা ও সর্বপ্রকার দুর্নীতির জঞ্জাল থেকে পরিস্কার করে সত্যিকারের জন-সেবার বাহন করে তোলা হোক।

সিংভূম জেলা কৃষক কর্মী সম্মেলন।

আগামী ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারী মুসাবনীতে সিংভূম জিলা কৃষক কর্মীদের প্রস্তাবিত সম্মেলন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আগামী ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহা আশানবাণীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সম্মেলনের বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্ত্তী,
সংযুক্ত কৃষাণ সভা কার্য্যালয়।
পোঃ ঘাটশীলা,
সিংভূম, বিহার।

নয়া-চীনের দৃঢ় অগ্রগতি

বেলঘরিয়ায় সুবোধ ব্যানার্জির বক্তৃতা

গত ৪ঠা জানুয়ারী রবিবার বেলঘোরিয়ায়, স্থানীয় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের উদ্যোগে, দেশপ্রিয় বিদ্যানিকেতনে শ্রীগোপী নাথ মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সদ্য চীন-প্রত্যাগত শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি তথাকার বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর বক্তৃতা করেন। প্রথমেই তিনি বলেন যে যাঁহারা চীনে কোন উন্নতিই হয় নাই বলিতেছেন, তাঁহারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই এইরূপ বলেন। তাঁহাদিগকে তিনি চীনের অতীত অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রী ব্যানার্জি বলেন যে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত চীনের গণবিপ্লবের প্রধান সাফল্য হইতেছে যে ইহা চীন জনগনকে আত্ম-মর্য্যাদা ও আত্মোপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক নূতন জাতির সৃষ্টি কারয়াছে। বক্তৃতায় তিনি চীনে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের অবস্থার প্রভূত উন্নতির উল্লেখ করেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য চীন সরকার ও জনগণের প্রচেষ্টার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে চীনাগণ যুদ্ধ চায়না, তাহারা শান্তিতে দেশ গঠন করিতে চায়; এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি রক্ষা করিতে সমগ্র চীন জাতি আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সর্ব্বশেষে তিনি চীনজনগনের ভারতীয়দের প্রতি দরদ প্রীতি ও ঔৎসুক্যের কথা উল্লেখ করেন।

বিদ্যানিকতনে যাইবার পথে শ্রীব্যানার্জি দ্বৈপায়ন পল্লীর কল্যান সঙ্ঘ ক্লাবটী পরিদর্শন করেন ও ক্লাবের জনকল্যানকর কার্য্যাবলীর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন।

'নয়াযুগ' তহবিলে সাহায্য করুন।

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দী মুখপত্র 'নয়াযুগ' আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পুণপ্রর্কাশিত হইবে। আর্থিক কারণে এযাবৎ নয়াযুগ' প্রকাশ স্থগিত থাকায় পাঠক ও দরদীদের পুনঃ পুনঃ তাগিদে পরিচালক মণ্ডলী 'নয়াযুগ' তহবিল সংগ্রহের উপর নিয়মিতভাবে নয়াযুগ পরিচালনার বন্দোবস্ত করিয়াছে। আপনাদের যথাশক্তি সাহায্য অবিলম্বে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া 'নয়াযুগ' সুপরিচালনায় তথা আপনাদের রুটি রুজীর সংগ্রামকে শক্তিশালী করিতে সক্রিয় অংশ নিয়ে এগিয়ে আসুন।

নয়াযুগ কার্য্যালয়, নিবেদক
C/o কমরেড অনিল সরকার শঙ্কর সিং,
ডিগওয়াডি কলিয়ারী ম্যানেজার, নয়াযুগ।
পোঃ জিয়লগোরা।
মানভূম বিহার

ট্রাইব্যুন্যাল রায় ও ট্রাম কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালী আচরণ

কিছুদিন আগে ট্রাইবুন্যালে স্থির হয় যে ট্রাম-ওয়ের সমস্ত কর্মচারীকেই প্রফিট বোনাস দিতে হবে। কিন্তু ট্রামকোং কর্তৃপক্ষ কিছু মজুরকে এই বোনাস দিয়ে কিছু মজুরকে তা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে শ্রমিক ঐক্যে বিভেদের এক অপচেষ্টা করে। কিন্তু দাবী আদায়ে ট্রাম শ্রমিকের যে দৃঢ় ঐক্য প্রদর্শন করে তাতে বিফল মনোরথ হয়ে কর্তৃপক্ষ এক নতুন চেষ্টা সুরু করেছে তাদের মধ্যে ফাটল ধরাবার।

কোম্পানী কিছুদিন আগে P. W. D. মজুরদের কাছে প্রস্তাব করে রবিবারের বদলে সোমবার সাপ্তাহিক ছুটী নেবার; কিন্তু শ্রমিকরা অসম্মত হওয়ায় তাদের ছাঁটাইয়ের হুমকী দেওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে কোম্পানীর এই জাতীয় খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে মজুরেরা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সংকল্প ঘোষণা করলে, কর্তৃপক্ষ নীরব হয়।

কোম্পানীর শ্রমিক-বিভেদ চেষ্টা ও অনুরূপ আচরণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, সরকারের নেতিবাচক নীতি-ও একে সাহায্য জোগাচ্ছে। তাই ট্রাম মজুরদের আজ প্রয়োজন, স্বচ্ছ ও সজাগ দৃষ্টি নিয়ে আরো দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গড়ে তোলা।

নিয়মিত ভাবে গণদাবী পড়ুন

আর এক দফা মুষিক প্রসবের তোড়জোড়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনা থেকে পরিস্কার বোঝা যায়। ১৯৫০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও ভারত সরকারের ভেতর যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সে চুক্তি অনুযায়ী ভারতের স্বার্থ মার্কিণ প্রভুদের পায়ে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

এই চুক্তি ভারত ও মার্কিণের ভেতর Technical Co-operation এর চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই কমিটিকে মার্কিণ পক্ষের ডিরেক্টর পরামর্শ দাতারূপে সাহায্য করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে সেই পরামর্শদাতার পরামর্শ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এক কথায় ভারত সরকারের যে কোন প্রস্তাব সেই ডিরেক্টরের নাকচ করার অধিকার থাকবে।

এছাড়া আরোও অন্যান্য ধারা থেকেও পরিস্কারভাবে মার্কিণ দাসত্বের পূর্বাভাষ পাওয়া যায় (যার বিশদ বিবরণ এই ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা অসম্ভব)। সুতরাং পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনা পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কিণী প্রভাব জাল বিস্তার করবে এতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পরিকল্পনাটির জমার হিসাব সম্পর্কেও বহু কিছু আলোচনা করার আছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোর উদ্বৃত্ত বাজেটের ওপর এই পরিকল্পনার ভবিষ্যত অনেকাংশে নির্ভর করছে। ১৯৫১-৫২ সালের কেন্দ্রীয় রাজস্বে ৯০ কোটী টাকার মত উদ্বৃত্ত ছিল, কিন্তু বর্তমান বছরে সেটা প্রচুর কমে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলোর উদ্বৃত্ত রাজস্বেরও প্রায় একই অবস্থা। অনেক ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্তের চাইতে ঘাটতির সম্ভাবনা বেশী। অথচ দেখা যাচ্ছে যে মূল পরিকল্পনার প্রায় ৩৫.৭% ভাগ এই ধরণের অনিশ্চয় অবস্থার ওপর নির্ভর করছে। ঘাটতিকে বাড়তি ধরে অঙ্ক কষে মূল পরিকল্পনার কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আশানুরূপ বৈদেশিক সাহায্য না পাওয়া গেলে আবোও প্রচুর ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েই গেল। জনসাধারণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ আদায় করার চিন্তা করা বাতুলতা—যেহেতু তারা ইতিমধ্যেই করভারে জরাজীর্ণ। অর্থ সংস্থানের একটি মাত্র উপায়ই আছে—সেটা হচ্ছে, বড় বড় পুঁজিপতিদের ওপর ট্যাক্স বসানো। কিন্তু সেটা কংগ্রেসী সরকারের নীতি-বিরুদ্ধ কেননা আমরা দেখেছি যে সরকার এর ভেতরই Excess Profit Tax ইত্যাদি তুলে দিয়েছে। বড় বড় শিল্পপতিরা চোখের ওপর আয়কর ফাঁকি দিচ্ছে—কিন্তু সরকার তাকে রোধ করার চেষ্টা তো করছেই না বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে সৎ কর্মচারী কোন শিল্পপতির আয়কর ফাঁকি ধরে দেওয়ার অজুহাতে চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। সুতরাং যে পথে সমস্যার সুরাহা কিছুটা হতে পারে সেপথে পুঁজিবাদী কংগ্রেসী সরকার পা বাড়াবে না। এই সমস্ত দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জনসাধারণের সামনে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন উপস্থাপিত করেছে।

দেশের সর্বতো অবনতির ব্যবস্থা।

পরিকল্পনার অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় দিকও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার কোন সমাধান নেই, খাদ্যাবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার কথা সুদূরপরাহত শিক্ষা কোন স্থানই লাভ করেনি। এক কথায় বর্তমান ভারতীয় জনজীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যাকে অবজ্ঞাই করা হয়েছে—তাকে সমাধান করার কোন প্রচেষ্টাই এতে নেই।

আর বাস্তবে তা থাকতেও পারে না। সরকার এখনও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করেনি—কোথাও কোথাও ক্ষতিপূরণ সহ উচ্ছেদের বুলি আওড়ানো হচ্ছে। ক্ষতিপূরণসহ জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের অর্থ হচ্ছে গরীব চাষীদের আরো অসহনীয় নিষ্পেন করা। গ্রামোন্নয়ের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোথায়ও চাষীর হাতে জমিবণ্টনের দাবী স্বীকৃত হয়নি। জমিদারী প্রথা বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদ না করে, চাষীর হাতে জমি না দিয়ে, ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করে কি করে যে দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা যায় সেটা বোঝা দুঃসাধ্য।

অন্যদিকে মূলশিল্প, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স ইত্যাদির জাতীয় করণ সম্পর্কে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করা হয়নি। যেখানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশেই শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে ভারত সরকার এবিষয়ে নির্বাক। বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা সম্পর্কেও সেই একই অবস্থা—বরঞ্চ পুনরায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে অধিকতর সুযোগ দেবার আশ্বাস জানানো হয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে একথা বুঝতে অসুবিধে হবে না যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা। এর নাম যদি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাও হয় তাকে জনসাধারণ আহবান জানাতে অক্ষম—কেননা এ সমাজতন্ত্র মেহন্নতী জনতার খুন চুষে টাটা, বিরলা, ডালমিয়ার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। যতদিন পুঁজিবাদ বর্তমান থাকবে এবং পুঁজিবাদী সরকার তার চালক হিসেবে থাকবে, ততদিন এ ধরণের পরিকল্পনার আর শেষ হবে না—জনসাধারণের দুর্গতিরও শেষ নেই। পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে উৎখাত করবার পথেই সত্যিকারের গণরাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে—সত্যিকারের কল্যাণকর পরিকল্পনাও সেদিনই সম্ভব। ভারতের পরিকল্পনার সাথে সোভিয়েট, নয়াচীন ইত্যাদির পরিকল্পনা তুলনা করলে তফাৎটা অতি সহজেই বোঝা যায়। সেসব দেশের অগণিত লোক পেয়েছে নতুন জীবনের আস্বাদ—গড়ে তুলছে নতুন সমাজ—নতুন দেশ। সেখানে পরিকল্পনার চেয়ে কাজ হয় বেশী—যেহেতু প্রতিটি লোক বুঝতে পেরেছে যে সে নিজের ও দেশের উন্নতির জন্যই কাজ করছে। এ বোধ ওপর থেকে চাপানো যায়না—বাস্তব অভিজ্ঞতাই এর একমাত্র উৎস। সে বোধ সে কর্মপ্রেরণা জানাবার জন্য, দেশকে নতুন করে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক গণআন্দোলনের পথে এগুতে হবে—সত্যিকারের দল বেছে নিয়ে এই আন্দোলনে সামিল হতে হবে। এটাই আজ একমাত্র নিশানা।

ষ্টেট ট্র্যান্সপোর্ট পরিচালনার প্রকাশ্য তদন্ত হয় না কেন ?

- অযোগ্যতা দূর করে জনসেবার ব্যবস্থা চাই।
- খয়ের-খাঁ-দের রাজত্বের অবিলম্বে অবসান হোক।

পশ্চিমবংগ ষ্টেট ট্র্যান্সপোর্ট বিভাগের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, আভ্যন্তরীণ কুশাসন এবং সাধারণের অর্থ নিয়ে ছেলেখেলার গুরুতর অভিযোগ সংবাদপত্রে, বিভিন্ন নেতাদের বিবৃতিতে ও বিভাগীয় কর্মচারীদের পক্ষ থেকে প্রায়ই করা হয়ে থাকে। সরকারের কাছে বারবার দাবী করা হয়েছে নিরপেক্ষ ও বেসরকারী তদন্তের। কর্তৃপক্ষ কিন্তু নীরব ও নির্বিকার। জনসাধারণও এই বিভাগের ভেতরকার খবরাখবর কমই জানতে পারেন। তবু ঘনঘন যান্ত্রিক গোলযোগ, অ্যাক্সিডেণ্ট এবং যে রকম টাইম-টেবলহীন খামখেয়ালী ঢংয়ে বাসগুলো পথে চলাচল করে থাকে, এসব থেকেই বাসযাত্রীরা বিভাগীয় অযোগ্যতার পরিচয় কিছু কিছু পেয়ে থাকেন। তাঁদের রাগ ও গালাগালি অবশ্য এসব ক্ষেত্রে কন্‌ডাক্টর ও ড্রাইভারের ওপরই বর্ষিত হয়ে থাকে। তাই সরকার পরিচালিত এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির পরিকল্পনার কিছু কিছু নমুনা তাঁদের জানা দরকার।

(১) এই বিভাগটির সৃষ্টি হয়েছিল চার বছরেরও আগে; কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে কাজ করতে হচ্ছে "অতিরিক্ত অস্থায়ী" রূপে। কাজেই বিভাগের ২৫০০ শ্রমিক ও কর্মচারী রয়ে গেছে টেম্পরারী। ফলে, বার্ষিক ইন্‌ক্রিমেণ্ট, চাকরীর গ্রেড নির্ধারণ, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুযোগ-সুবিধা কিছুই তাদের দেওয়া হয় না।

(২) আজ পর্যন্ত লিখিত কোন আইনকানুনের প্রচলন হয়নি এবং অফিসারদের (যে কোন স্তরেরই হোক না কেন) মুখের কথাই হ'য়ে আছে আইন। তাদের মর্জি ও খেয়াল মাফিক কর্মচারীদের কারণে অকারণে সাসপেণ্ড, চার্জশীট দাখিল, বরখাস্ত পর্যন্ত ঘটে থাকে।

(৩) দৈনিক ৮ ঘণ্টার যায়গায় ১০-১১ ঘণ্টা খাটিয়ে নেওয়া হয় নির্বিবাদে; কোন ওভারটাইম দেওয়া হয় না তার জন্য। পূজো, নির্বাচন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে (যখন অন্যান্য শিল্পের কর্মচারীদের ছুটী মেলে) তাদের পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে হাড়ভাঙ্গা ওভারটাইম খাটিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত এক পয়সাও অতিরিক্ত জোটেনি।

(৪) কারখানা ও মেকানিক্যাল ষ্টাফে আছে মোট কর্মচারীর এক-চতুর্থাংশের বেশী। এদের ছুটীর সুবিধা ত' নেই-ই, যখন তখন এবং রাত্রিতেও ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নেওয়া হয়, বিনা পয়সায়। সুদক্ষ, অভিজ্ঞ মেকানিকদেরও অনেকটা menials-য়ের পর্যায়ে ফেলে রাখা হয়েছে এবং কর্তাদের ব্যবহারও তারা পেয়ে থাকে চাকরের মতই।

(৫) এবার গাড়ীর খবর শুনুন। সরকারের কারবার কোন্ কোন্ কোম্পানীর সংগে জানি না। তবে যে দিন থেকে বাসগুলো আমদানী হ'য়েছিল তার প্রথম দিন থেকেই নাকি তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ গ্যারেজে অকেজো হ'য়ে পড়ে আছে। আজ পর্যন্ত গাড়ী কেনা হ'য়েছে তিন শ'র ওপর। কিন্তু পথে এখনও কোনদিনই নাকি পোনে দু'শ' গাড়ীও ছাড়া হয় না; যা ছাড়া হয় তার মধ্যেও আবার গোলযোগ, অ্যাক্সিডেণ্ট লেগেই আছে।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রোজেনবার্গ-দম্পতির প্রাণরক্ষার দাবীতে

ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রোজেনবার্গ দম্পতির ফাঁসীর হুকুম রদ করিয়া অবিলম্বে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের প্রতি ন্যায় বিচার করিবার ও বিশ্ব-জনমতকে স্বীকার করিয়া লইবার দাবী জানাইয়া এস. ইউ. সির সাধারণ সম্পাদক কম্ শিবদাস ঘোষ ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলসের নিকট এক তার পাঠাইয়াছেন।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।